মিডিয়া বিস্ফোরণ ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য --- এই বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমি এর ভূমিকায় কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

আজ থেকে পাঁচ বছর বা সাত বছর আগে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো এই প্রসঙ্গগুলি আসতনা, প্রথম যে প্রসঙ্গ সেটি হচ্ছে ইরাকের উপর মার্কি ন বা ব্রিটিশ জোটের আক্রমণ--- আমি সেই যুদ্ধ যে পরিপ্রেক্ষিত এবং কেন যুদ্ধ সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। যুদ্ধের সঙ্গে গণ মাধ্যমের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সমাজতত্ত্ববিদরা সব সময় বলেন Truth is the First Casualty of the war । যুদ্ধের এই যে প্রথম শহীদ হচ্ছে সত্য তার জন্য দায়ী গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা। ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে আরও আলাদা মাত্রা নিয়ে তা হাজির হয়েছে। ইরাক যুদ্ধের সময় সমাজতত্ত্বদিরা যে শব্দটি সামনে নিয়ে এসেছিলেন সেটি হচ্ছে Embedded Journalism – Embedded Journalism বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হল এই যে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সাংবাদিক বা Journalism বা গণমাধ্যমকে একেবারে এক জায়গায় নিয়ে আসা। একথা অন্তর্বস্তুর দিক থেকে যেমন সত্য, কাঠামোগত দিক থেকেও তেমনি সত্য। এই কারণে আপনারা জানেন ইরাক আক্রমণের সময় ব্রিটিশ - মার্কিন সেনাদের হেড কোয়ার্টারটি ছিল কাতারের দোহায়। দোহা শব্দটি আমাদের খুবই পরিচিত, যেহেতু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চতুর্থ মন্ত্রী পর্যায়েরসম্মেলন ২০০১ সালে দোহাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দোহাতেই ছিল সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর এবং সেই দপ্তরের পাশেই অত্যাধুনিক ব্যবস্থাস্পন্ন গণমাধ্যম কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছিল। দেশি - বিদেশি সাংবাদিকরা সেখানে বসে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এটির দিকে তাকিয়ে প্রধানত বলা হয়েছিল Embedded Journalism, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে সংবাদ মাধ্যম তাদের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে এটি কতখানি সত্য। আমার কাছে এসোসিয়েট প্রেসের দুটো ক্লিপিং আছে। গত ১৪ই ডিসেম্বর যেদিন সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন এসোসিয়েট প্রেসে সারা বিশ্বের সংবাদপত্রগুলির কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে এই মর্মে যে, ইতিহাসের সব থেকে নিষ্ঠুর ডিকটেটর সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছে। দু'ঘন্টা পর যে মেসেজ পাঠান হচ্ছে তাতে তাঁরা বলছেন, ইরাকের প্রাক্তন ডিকটেটর সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছে। অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে একটা বিশেষণ দেওয়া। সবাই জানে যে সাদ্দাম ইরাকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। সাধারণভাবে এটাই বলা উচিত ছিল ইরাকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার। কিন্তু বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে Worst Dictator সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এটা হচ্ছে Embedded Journalism এর একটা বড় দৃষ্টান্ত। ইরাক যুদ্ধের সময় আমরা এই ধরণের ঘটনা দেখি। আরও দেখেছি টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে বিবিসির একটা বিরোধ এবং এই বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল বৃটেনের বিখ্যাত বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল ওয়ার বিশেষজ্ঞ ডেভিড কেলির আত্মহত্যা। তাঁর এই আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে বিবিসি যেটা প্রকাশ করেছিল, তা হচ্ছে যে ইরাকের বিধবংসী অস্ত্রের খবর টনি ব্লেয়ার পেয়েছিলেন ২৫-২৬ বছর বয়সের এক অর্দ্ধ উন্মাদ ব্রিটিশ নাগরিকের কাছ থেকে। সে ইন্টারনেটে এই খবরটি দিয়েছিল যে, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণ বিধবংসী অস্ত্র আছে। এটা বিবিসি প্রথম প্রকাশ করে দেয় এবং তাকে কেন্দ্র করে বিবিসি -র সাথে টানি ব্লেয়ারের বিরোধ বাধে। এর মূল কারণ হল এই যে, মূলত ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিবিসি এবং সিএনএন'র যে

বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনা। এই জন্যই বিবিসি প্রধানত টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে একটা কৃত্রিম লড়াই শু করেছিল। কিন্তু একে কেন্দ্র করে যেটা হচ্ছিল সেটা এই যে, সাংবাদিকতা কোথায় যেতে পারে, গণমাধ্যম কোথায় যেতে পারে, ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। এর একটা ইতিবাচক দিক আছে সেটা হল ১৪ই ডিসেম্বর যখন সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার হন সেটা যখন এখানের সন্ধ্যায় ৬টার খবরে আমরা জানতে পারি প্রথমে সিএনএন পরে বিবিসি থেকেও তা জানান হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রথম যে প্রতিক্রিয়াটি হয়েছিল, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছেতিনি সত্যিই কি সাদ্দাম? এটাই হচ্ছে একটা বড় রকমের দিক, কেন না যে গণমাধ্যম সাংঘাতিক রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মানুষের কাছে হাজির হয়েছিল সাদ্দাম হোসেন গ্রেপ্তার হবার পর প্রথম প্রশ্নটি মানুষই করেছিল যে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি সত্যিই কি সাদ্দাম হোসেন? অর্থাৎ এই ইরাক আক্রমণকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমের সঙ্গে যে সম্পর্ক এই আলোচনার যে বিষয়বস্তুর তাতে নতুন একটা মাত্রা সংযোজন করেছে। এর বিপরীত দিকও আছে। পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত ব্রিটিশ সাংবাদিক আর্নল্ডকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি যে সংবাদ সংস্থার সাথে যুক্তছিল সেখান থেকে তঁাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি সঠিক কিছু সংবাদ দিয়েছিলেন। এইরকম কিছু সংবাদপত্র ও কিছু সাংবাদিককে আক্রমণ করা হয়েছিল। আল জাজিরার যে টেলিভিশন চ্যানেল আছে তার দপ্তরে বোমা বর্ষণ করে ঘটনাকে বিশ্বাসীর কাছে হাজির করার চেষ্টা করেছে। এই দিক থেকে মিডিয়া বিস্ফোরণের ঘটনাকে বিশ্বাসীর কাছে হাজির করার চেষ্টা করেছে। এই দিক থেকে মিডিয়া বিস্ফোরণের নতুন একটা দিক আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ইরাক আক্রমণের সময়।

দ্বিতীয়ত একটা বিপজ্জনক দিক জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের আছে তা হয়তো আপনারা জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ২৬ শতাংশ বিদেশি মালিকানা নিয়ে বিদেশি সংবাদপত্র আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করতে পারবে। অর্থাৎ যেভাবে Insurance Regulatory Authority -র মাধ্যমে বিদেশি বিমা কোম্পানি আমাদের দেশি বেসরকারি বিমা কোম্পানির ২৬ শতাংশ অংশীদারিত্বে ব্যবসা করবে, যার সূত্র ধরে আমাদের এখানে টাটা -এ আইজি, বিড়লা - সানলাইফ, ম্যাক ইন্ডিয়া, লাইফ ইন্সিওরেন্স, আইসিআইসি প্রুডেন্সিয়াল প্রভৃতি প্রভৃতি বিদেশি বিনা কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে এসেছে ঠিক একইভাবে ২৬ শতাংশ মালিকানা নিয়ে বিদেশি সংবাদপত্রগুলো আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। একে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল একটা বিতর্ক ছিল। দুটো প্রেস কাউন্সিল তৈরি হয়েছিল, একটা ১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষে যে প্রেস অ্যাক্ট হয় এবং তার আগেএকটা ইন্টারিম রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষে যে প্রেস অ্যাক্ট হয় এবং তার আগে একটা ইন্টারিম রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ভারতবর্ষের মাটি থেকে কোনও বিদেশি পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারবে না। ব্যতিক্রম ছিল রিডার ডাইজেস্ট। কারণ রিডার ডাইজেস্ট প্রেস কাউন্সিল গঠিত হবার আগে থেকেই ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত হত। ফলে আমাদের দেশে বিদেশি মালিকানাধীন কোনো সংবাদপত্র বিক্রি হতে পারত যেমন ইকনমিস্ট, নিউজ উইক, গার্ডিয়ান, উইক প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের এখান থেকে বিদেশি সংবাদপত্র বা তার সংস্করণ বের করতে পারত না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের সংবিধানে ভারতবর্ষে কোনও বিদেশির Right to life অর্থাৎ বাঁচার অধিকার দেওয়া আছে অর্থাৎ কোনও বিদেশি নাগরিক এখানে খুন করলে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তার বিচার হবে কিন্তু কোনও বিদেশির Right of Speech অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা দেওয়া নেই। বিদেশি সাংবাদিক বা কোনও বিদেশি নাগরিক মনুমেন্টের তলায় এসে অটলবিহারীবাজপেয়ী বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সমালোচনা করতে পারেন না। একই কারণে আমাদের এখানে কোনও বিদেশি সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিগত কেন্দ্রীয় সরকার, এনডি এ জোট সরকার দু-দুটো প্রেস কাউন্সিল জোরের সঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছিল তাকে উড়িয়ে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আনন্দবাজার পত্রিকা ইতিমধ্যেই রূপার্ট মার্ডকের স্টার নিউজ গোষ্ঠীর সাথে কোলাবোরেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই রূপার্ট মার্ডকঅর্থাৎ স্টার গোষ্ঠীর যে মালিক তিনি হচ্ছেন সারা পৃথিবীর যে মিডিয়া ব্যারন আছে তার অন্যতম। এই স্টার মানেতো তারা নয়, এটা একটা সংক্ষিপ্ত নাম --- সাটেলাইট টেলিভিশন ফর এশিয়াটির রিজিয়ন ---এটা হচ্ছে স্টারের পুরো নাম, সারা পৃথিবী জুড়ে ওদের নেটওয়ার্ক আছে। বৃটেনের যে জনপ্রিয় টেলিভিশন স্কাই টিভি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল ফক্স টিভি তার মালিক হচ্ছে রূপার্ট মাডার্ক এবং তার নিউজ এজেন্সি আছে;প্রধানত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বৃটেনের ১৭৫টা সংবাদপত্রের তিনি মালিক। এ হেন স্টার গোষ্ঠীর সঙ্গে, রূপার্টমার্ডাকের সঙ্গে আনন্দবাজার কোলাবোরেশন

করেছে। এটা আপনারা জানেন যে, শুধু টনি ব্লেয়ারের নির্বাচন নয়, জর্জ বুশ জিতেছিলেন কি না সন্দেহ কিন্তু সেই জর্জ বুশের সম্পূর্ণ নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করেছিলেন এই রূপার্ট মার্ডাক। এই রকম একটা লোক আনন্দবাজারের মত সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে যেটা শোনা যাচ্ছে ২৬ শতাংশ শেয়ার নিয়ে ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল থেকে শু করে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস প্রভৃতি সংবাদপত্রের গোষ্ঠীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাথে কোল াবোরেশনে ভারতবর্ষের অভ্যন্তর থেকে প্রকাশিতহতে যাচ্ছে।

তাহলে আরও একটা বিপজ্জনক দিকের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি। একে বিদেশি টিভি, বিদেশি রেডিওর ঠ্যালায় আমাদের এখানকার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি বিদেশি সংবাদপত্রও আমাদের এখানের সংবাদপত্রের সাথে কোলাবে ারেশনে প্রকাশিত হয় তাহলে এক বড় ধরণের দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমরা করছি। সেই দিক থেকে এটা - একটা গুত্বপূর্ণ ঘটনা আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে।

তৃতীয়তঃ দুটো গুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে রাজ্যের ক্ষেত্রে। তার প্রথম একটি হচ্ছে যে এখান থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একটি বাংলা দৈনিক বের করবে এবং সম্ভাব্য যে দিনটি ঠিক করেছিল তা হল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন (পরে অবশ্য পারিকাঠামোগত সমস্যার কারণে দিনটি পিছিয়ে গেছে)। এর জন্য তারা বিখ্যাত এক কোম্পানিকে দিয়ে মার্কেট সার্ভে করিয়েছিল। ভাবতে পারেন মার্কেট সার্ভে কাদের হয়। যে কোনও কমোডিটির হয়। কোনও কসমেটিকস বা ঐ জাতীয় জিনিস বাজারে আসার আগে মার্কেট সার্ভে হয়। সাংবাদপত্রের মার্কেট সার্ভে হচ্ছে। স্টেটসম্যান পত্রিকা যদি একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করে তবে মানুষ কিভাবে সেটাকে দেখবে তাই নিয়ে একটা বিখ্যাত সংস্থা মার্কেট সার্ভে করেছে এবং স্টেটসম্যান পত্রিকা বাংলা সংস্করণ বের করেছে ১৮.০৬.২০০৪ থেকে, এর পরিণতিটা কি হবে আমরা ভাল করেই বুঝতে পারছি, কেননা স্টেটসম্যানের ইংরাজি সংস্করণের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা জ ানেন যে এদের এডিটোরিয়াল পলিসি কি !

দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ যার সঙ্গে আমাদের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের স ম্পর্ক তা হল এই যে পশ্চিমবাংলায় ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে এই রাজ্যের গণমাধ্যম বিশেষ করেযার নেতৃত্বে আছে আনন্দবাজার গোষ্ঠী। ১৯৭৭ সাল থেকে যে কোনও ধরনের কাযকলাপের বিরোধিতা করেছে আনন্দবাজার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যর বিরোধী দল তৃণমূল যাতে বিজেপি-র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয় তার প্রধান উদ্যোক্ত ছিল আনন্দবাজার এবং সেই সময় একাধিক নিবন্ধ আনন্দবাজার এবং দেশ পত্রিকায় লিখে প্রমানের চেষ্টা করেছে যে বামফ্রন্টকে যদি ক্ষমতাচ্যুত করতে হয় তৃণমূল বিজেপি জোট নয়, কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস জোট প্রয়োজন। একে কেন্দ্র করে একাধিক লেখা আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকরা লিখেছেন শুধু তাই নয়, আনন্দবাজরের মালিক স ম্পাদক অভীক সরকারের বাড়িতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে বসে যড়যন্ত্র করেছেন যাতে তৃণমূল বিজেপি জোট ছেড়ে কংগ্রেসের সাথে জোট গড়ে। সব থেকে বড় ব্যাপার যে স্লোগানটা তৃণমূল ব্যবহার করেছিল উল্টোদাও পাল্টেদাও সেই সেই স্লোগানটা সরবরাহ করে আনন্দবাজার গোষ্ঠী কারণ তৃণমূল কংগ্রেস এই স্লোগানটা দেওয়ার পরে পরেই দেশ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় উল্টে দেখুন পাল্টে গেছে। নির্বাচনের আগে এই ধরণের একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যে আনন্দবাজার যুক্ত ছিল বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সেই আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। ম ানুষের সামনে দেখানোর চেষ্টা করল যে আগের পাঁচটা বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে এই বামফ্রন্ট সরকারের পার্থক্য আছে। জ্যোতি বসুর সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পার্থক্য আছে, এমন একটা প্রচারের ধারাকে তারা শু করল যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে, বামফ্রন্টকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে একটা বিপুল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। ওরা জানত যে, এই প্রত্যাশা তৈরি করার মধ্যে ঝুঁকি কিছু নেই কারণ ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর কোনও নির্বাচন নেই, ২০০২ সালে কোনও নির্বাচন নেই, ২০০৩ সালে কোনও নির্বাচন নেই সুতরাং বামফ্রন্টের পক্ষে যতই আমরা হওয়া তৈরি করি না কেন তার কোনও রাজনৈতিক সুবিধা বামফ্রন্ট পাবে না। এখন ওর যেটা করতে চাইছে সেটা হল যে প্রত্যাশার বেলুনটি ওরা তৈরি করেছিল তাতেপিন ফোটানো। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যতই ভাল মানুষ হোন না, তাঁর যতই সদিচ্ছা থাকুক, তাঁর আশে পাশে যাঁরা আছেন তাঁরা খুব খারাপ। সিআইটিইু/ কো - অর্ডিনেশন কমিটি ইত্যাদি মিলিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কোনও ভালে া কাজ করতে দেবে না। এই যে প্রচারের একটা নতুন কৌশল, সেই কৌশলটা আমরা বিগত পাঁচটা বামফ্রন্ট সরকারের

আমলে দেখিনি।
২০০৩ -এর ১৬ জুলাই যখন প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে সফরে এসেছিলেন তখন পশ্চিমবাংলায় একটা নামজাদা হোটেলে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পাশে বসিয়ে পশ্চিমবাংলা নিয়ে কতকগুলো কুৎসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শালীনতার স্বার্থে এর প্রতিবাদ করেননি। সেখানে বলা হল এটাই জ্যোতি বসুর সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পার্থক্য। জ্যোতি বসু যদি হতেন ঐখানে দড়াডিয়ে কথাগুলোর প্রতিবাদ করতেন কিন্তু পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য বলেছেন তা ন্যায়সঙ্গত ফলেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার কোনও প্রতিবাদ করেননি, মেনেনিয়েছেন। ১৯ শে জুলাই সাংবাদিক সম্মেলন করে যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, একটা মেঠো বক্তৃতা দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে অসত্য; তার পরের দিন আনন্দবাজার সম্পাদকীয় লিখল। যে আনন্দবাজার অরণ্যে রোদন সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বলেছিল মহান মুখ্যমন্ত্রী তারাই ২০শে জুলাই সম্পাদকীয়তে লিখল ঝগড়াটে মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই যে পরিবর্তন এবং ষষ্ঠবামফ্রন্ট পরবর্তীতে আনন্দবাজারের যেএডিটোরিয়াল পলিসি গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে আর একটা বিপজ্জনকদিক।যে আনন্দবাজারকে এক থেকে পাঁচটা বামফ্রন্টের সময় যেভাবে আমরা চিনেছিলাম আজকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদ তৈরি করছে। সুতরাং ইরাককে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র গণমাধ্যমে যে ভূমিকা, প্রেস কাউন্সিলের সমস্ত সুপারিশকে আগ্রহ্য করে ২৬ শতাংশ বিদেশি মালিকান নিয়ে বিদেশি সংবাদপত্রের আমাদের দেশে প্রবেশ, স্টেটসম্যানের পত্রিকার বাংলা সংস্করণ প্রকাশ এবং ষষ্ঠ বামফ্রন্টকে ঘিরে আন্দবাজার পত্রিকার নেতৃত্বে এ রাজ্যের গণমাধ্যমে একটা অংশের পরিবর্তিত ভূমিকাকে যদি দেখি তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নতুন একটা মাত্রা অর্জন করতে পারবে।
দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, গণমাধ্যমের বিস্ফোরণের বিষয়ে যদি আমরা প্রবেশ করতে চাই এবং সেখানে থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয় তাহলে প্রথম যে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে তা হলগণমাধ্যমের সাথে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। গণমাধ্যম কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে বা সমাজ গণমাধ্যম থেকে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এ সম্পর্কে বিশিষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ হাবার্ড শিলারের মাইন্ডম্যানেজার্স গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। হাবার্ড শিলার গণমাধ্যমকে সঠিকভাবে চিহিত করেছিলেন যে, এটা হচ্ছে মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্ড্রাস্ট্রি। গণমাধ্যমকে শিল্পের আলোকে প্রথম চিহিত করেছিলেন হাবার্ড শিলার। তাঁর মাইন্ড ম্যানেজার্স গ্রন্থে তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, আজকের গণমাধ্যম হচ্ছে একটা শিল্প। এবং সেই শিল্পটা হচ্ছে মাইন্ডম্যানেজমেন্ট ইন্ড্রাস্ট্রি। অর্থাৎ মানুষের যে মস্তিষ্ক সেই মস্তিষ্ককে পরিচালনা করে তার মতামত দেওয়ার যে ক্ষমতাকে পরিচালনা করে আজকের গণমাধ্যম। শিলার তার গ্রন্থে প্রধানত তিনটি স্তরে গণমাধ্যমের সঙ্গে আজকের সমাজের যে সম্পর্ক তাকে চিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তথ্যের জন্য মিডিয়ার উপর মানুষ যত বেশি নির্ভরশীল হবে মিডিয়া তত বেশি কৌশলগত দিকথেকে তার মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবে। আনন্দবাজারের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যে বক্তব্য আমি প্রথমেই হাজির করলাম তার সাথে হাবার্ড শিলার প্রথম যে তত্ত্বটি হাজির করেছেন তার মিলরয়েছে।
হাবার্ড শিলারের দ্বিতীয় সূত্র হল, মিডিয়া থেকে যে তথ্যবলি সমাজ পাচ্ছে সেই তথ্যাবলি যাতে বেশি শক্তিশালী হবে মিডিয়া সেই সমাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ মানুষ যদি তার নিজের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ না করে, সম্পূর্ণত মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, মিডিয়া তার উপর তত বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।
হাবার্ড শিলার তৃতীয় যে প্রসঙ্গটি বলেছিলেন--- কোনও সমাজে মিডিয়া যদি ব্যপক শক্তির অধিকারী হয় তবে সমাজের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্বগুলিকে মানুষ মিডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবে। ফলে তার নিজস্ব কোনও দর্শন, নিজস্ব কোনও দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাওয়া যাবে না। আমরা অনেক সময় দেখি বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে আস্থাশীল রাজ্য বা শ্রমজীবী মানুষ তার আন্দোলন সম্পর্কে তার দাবী দাওয়া সম্পর্কে অনেক সময় এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যেটা তার দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মিডিয়া এক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করে। এই গণমাধ্যম যত বেশি শক্তিশালী হবে সেক্ষেত্রে মানুষ ততবেশি তার সামাজিক সংঘাতগুলি সমাধানে মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এইখানে গণমাধ্যমের সঙ্গে সমাজের যে সম্পর্ক তা নিহিত রয়েছে।
আমার তৃতীয় যে প্রস্তাবনা নোয়াম চমস্কি এবং হামারম্যান লিখিত ক্যাপিটালিজম এ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন এজ পুস্তকে যে প্রে

াপাগান্ডা মডেল সব থেকে বেশি আলোচিত হচ্ছে সে সম্পকে; নোয়াম চমস্কি ম্যানুফ্যাকচারিং অব দি কনসেন্ট -এ পাঁচটি উপাদানের কথা আমাদের সামনে হাজির করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন, সংবাদপত্র অবশ্যই ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকবে এবং মালিকের স্বার্থকে সামনে রেখে সংবাদপত্র পরিচালিত হবে। আজকের গণমাধ্যমের জগৎ সম্পর্কে যে ফর্মুলেশন নোয়াম চমস্কি করেছেন তা একেবারে খাঁটি। দ্বিতীয় যে উপাদানের কথা বলেছেন তা হল, বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে থাকবে। আপনি যদি দু টাকা দিয়ে একটা আনন্দবাজার কেনেন তবে দেখবেন সেই পরিমাণ সাদা কাগজের দাম ২ টাকার থেকে বেশি। অনেক বেশিহয়। এটা মনেরাখা দরকার যে তা ত্রেতার অর্থে চলে না। সংবাদপত্র চলে বিজ্ঞাপনের টাকায় এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্র চালনার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই প্রোপাগান্ডা মডেলে নোয়াম চমস্কি বলেছেন বিজ্ঞাপন হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে গুত্বপূর্ণ উপাদান। তৃতীয় যে উপাদানের কথা বলেছেন তা হল নিউজ সোরসিং। সংবাদের উৎস অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ প্রোপাগান্ডা মডেলের ক্ষেত্রে। কথাটা এই জন্য বলছি যে ধন ১৯৮৯ সালে তিয়েনমেন স্কোয়ারের যে ঘটনাটি ঘটে সেই ঘটনার পর সারা বিশ্ব বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটা হেড লাইন পড়ে গিয়েছিল। চিনের রাষ্ট্র নায়করা ঘাবড়ে গিয়েছিল। এই সংবাদ পরিবেশন করেছিল আমেরিকার এসোসিয়েট প্রেস এপি। এই ঘটনাটা যে মিথ্যা তা দেখানোর জন্য চিনের টেলিভিশনে লি পেং কে দিয়ে বক্তৃতা করান হল। পরের দিন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম বলল লি পেং এর পায়ে গুলি লেগেছে। তার পা ভেঙ্গে গেছে। পরের দিন চিনের টেলিভিশনে লি পেংকে হাঁটতে হাঁটতে বক্তৃতা করতে দেখান হল এটা বোঝানোর জন্য যে তাঁর পায়ে কিছু হয়নি। পরবর্তীকালে এটা অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে হংকং এক একটা ছোট্ট সংবাদপত্র পত্রিকা মা হিউ এই খবরটি ছেপেছিল এবং মা হিউ -এর কাছ থেকে সংবাদটি সংগ্রহ করেছিল এপি, যেহেতু এ পি-র বিশ্বাসযোগ্যতা আছে তারা সারা পৃথিবী জুড়েএই সংবাদ প্রচার করেছিল এবং মানুষ তা বিশ্বাস করেছিল। অর্থাৎ নিউজের যে সোসির্ং, প্রোপাগান্ডা মডেলের সেটি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ বিষয়।

চতুর্থ যেটা, তা হচ্ছে ভুল সংবাদ, অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা এবং এগুলি এমনভাবে করা, যাতে মানুষ বুঝতে না পারে এগুলি অসত্য।

পঞ্চম উপাদান হচ্ছে অ্যান্টি কমিউনিজম। কমিউনিজিমের বিরোধিতা আজকে প্রোপাগান্ডা মডেলের গুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আনন্দবাজার এবং অন্য একাধিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে উপাদানটি দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটা ঘটনার কথা বলা যায়। ১৯৮৯ সালে তিয়েনমেনেন স্কোয়ারের যখন ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে ২০শে মে থেকে ১১ ই জুন, এইসময় বাংলাদেশের একটি পত্রিকা সমীক্ষা করেছিল। এই ২৩দিনে ঐ ঘটনাকে নিয়ে ভাতরবর্ষের চারটি বৃহৎ সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনকে তারা বিচার্যের মধ্যে এনেছিল। এরা হল --- স্টেটম্যান, আনন্দবাজার, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং মালায়ালাম মনোরমা। চিনের খবর কিভাবে এই চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তার বিষয়ে আমি যাচ্ছি না; আমি শুধু দুটি বিষয়ে এখানে আলোচনা করব। একটি হচ্ছে, এই চারটি সংবাদপত্র তিয়েনমেন স্কোয়ারের ঘটনা নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। স্টেটসম্যান পত্রিকায় এই ২৩ দিনের মধ্যে ২০টি বিদেশ সংত্রান্ত সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল যার মধ্যে চিন নিয়ে ৭টি, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ ছিল চিন। আনন্দবাজার পত্রিকা ১২টি সম্পাদকীয় লিখেছিল বিদেশি খবরের উপর, তার মধ্যে ৭টি ছিল চিন সংত্রান্ত অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সম্পাদকীয় লিখেছিল ১৬ টি তার মধ্যে চিন সংত্রান্ত ৪টি অথ্যাৎ ২৫ শতাংশ আর মালায়ালাম মনোরমা ৪টি যে সম্পাদকীয় লিখেছিল তার ২টি চিন সংত্রান অর্থাৎ ৫০ শতাংশ। ঐ একই সময়ে যে উত্তর সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি বিষয় সংত্রান্ত যে সব উত্তর সম্পাদকীয়, তার মধ্যে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৬ সতাংশ, আনন্দবাজারে ১০০ শতাংশ, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ১২ শতাংশ, মালয়ালাম মনোরমায় ৬৬ শতাংশ ছিল চিল সংত্রান্ত। এই তথ্যগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বা স্টেটসম্যান প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী হলেও চিন সংত্রান্ত খবর, সম্পাদকীয় ও উত্তর সম্পাদকীয় বেশি লেখা হয় আনন্দবাজার ও মালয়ালাম মনোরমা। কেন না আনন্দবাজার পড়েন মূলত বাংলার সাধারণ মানুষ, যে বাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা ঘাঁটি আর মালায়াম মনোরমা হল কেরলের একটি পত্রিকা যেখানে কমিউনিস্টদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তুলনামুলকভাবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রকাশিত হয় মুম্বাই থেকে যেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব তেমন নেই। সেই কারণে তিয়েনমেন স্কোয়ারের ঘটনা

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় সেভাবে আলোচিত হয়নি। অ্যান্টি কমিউনিজম হচ্ছে আজকের গণমাধ্যমের প্রধান শক্তি যে কারণে আনন্দবাজার পত্রিকা তিয়েনমেন -এর ঘটনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলছে কমিউনিজম সংকটে। আপনারা কি কখনও দেখেছেন সিয়াটেলে যখন বিক্ষোভ হয়, ওয়াশিংটনে যখন বিক্ষোভ হয় তখন কি আনন্দবাজার বলে ধনতন্ত্র সংকটে । পশ্চিমবাংলায় যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন বলে বামফ্রন্ট সরকার সংকটে। কিন্তু কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে আন্দোলন হলে তারা বলে না বিজেপি -র দর্শন বা মতাদর্শ সংকটে। এই যে প্রোপাগান্ডা মডেল, এই যে অ্যান্টি কমিউনিজম যেটাকে নোয়াম চমস্কি বলেছেন সব থেকে ইম্পরটেন্ট ইস্যু। গণমাধ্যমকে অবশ্যই অ্যান্টি কমিউনিস্ট হতে হবে এবং অ্যান্টি কমিউনিজম হচ্ছে প্রোপাগান্ডা মডেলের সব থেকে গুত্বপূর্ণ ধারা।

আমার চতুর্থ যে প্রস্তাবনা, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কতগুলি ধারা আমাদের সামনে আছে। প্রথম ধারাটি হচ্ছে সনাতনী ধারা। সনাতনী ধারা বা এর যে ধারক - বাহক তাঁরা মনে করেন সংবাদ মাধ্যম সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করবে এবং গণমাধ্যম সরকারকে পরিচালনা করার জন্য মানুষের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করবে এবং এই দিক থেকে তারা গণমাধ্যমের ভূমিকাকে প্রধান হিসাবে দেখে। এর প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন এডমন্ড বার্ক। যিনি ফরাসি বিপ্লবের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। যিনি ওয়ারেন হেস্টিংস এর বিচার করেছিলেন এবং প্রধানত শিল্পপুঁজির প্রতিনিধি ছিলেন। ইংল্যান্ডে যখন বাণিজ্য পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির দ্বন্দ্ব হচ্ছে তখন এডমান্ড বার্ক শিল্পপুঁজির পক্ষে ছিলেন। শিল্প পুঁজির প্রতিনিধি এডমন্ড বার্ক - এর মতে মানুষ যদি প্রশাসন দ্বারা আত্রান্ত হয়, প্রশাসন যদিমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয় তবে ফার্স্ট এস্টেট হিসাবে তিনি চার্চের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মানুষ প্রথমে চার্চের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাবে তার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তা যেন তুলে নেওয়া হয়। চার্চ যদি তাকেফিরিয়ে দেয় তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে আইনসভা, যেখানে সে যাবে; সেখানে প্রত্যাখ্যাত হলে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে সে যাবে বিচার ব্যবস্থার কাছে এবং সেখানে যদি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে চতুর্থ পদক্ষেপ হিসাবে সে যাবে সংবাদপত্রে কাছে। সংবাদপত্র হচ্ছে এই ধারার মতে ফোর্থ এস্টেট। এই যে উদার এবং সনাতনী ধারা মনে করত যে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম (তখন সংবাদপত্রই ছিল মূল গণমাধ্যম) এতই শক্তিশালী যে রাষ্ট্র যদি কোনও আত্রমণ করে তবে সেখান থেকে এই গণমাধ্যম তাদের মুক্তি দেবে। কিন্তু এই ধারার সব থেকে দুর্বলতা ছিল এই যে বৃহত্তর সমাজের সাথে যুক্ত করে তারা গণমাধ্যমকে কখনও দেখেনি।

গণমাধ্যমের দ্বিতীয় যে ধারা সব থেকে শক্তিশালী সেটা হচ্ছে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক ধারা। জার্মান আইডোলজিতে কার্ল মার্কস এই ধারার উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন উৎপাদনের উপকরণের উপর যে শ্রেণি আধিপত্য করবে সেই শ্রেণি গণমাধ্যমের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে। জার্মান আইডোলজিতে মার্কসের এই বক্তব্যকে পরবর্তীকালের থুসা এবং গ্রামসি ডেভেলপ করেছিলেন। অ্যালান থুসা বলেছিলেন, রাষ্ট্র হচ্ছে নির্মম শোষণের যন্ত্র এবং তাকে ঘুরিয়ে দেখা হচ্ছে গণমাধ্যম। পলিটিক্যাল সোসাইটি ও সিভিল সোসাইটির বক্তব্য নিয়ে গণমাধ্যম সম্পর্কে গ্রামসি বলেছিলেন, উৎপাদন ব্যবস্থাকে যদি দখল না করা যায় তাহলে গণমাধ্যমের উপর কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আজকের দিনে এই মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক যে ধারা এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক আলোচনাটা এই ধারার ভিত্তিকেই করা উচিত।

র‍্যাডিক্যাল ধারা একটা ছিল, যে ধারা মনে করত গণমাধ্যম নিরপেক্ষ একটা আম্পায়ারের ভূমিকা নেবে। জনগণ যদি অন্যায় করে জনগণকে সে শাস্তি দেবে, যদি রাষ্ট্র বা মালিকশ্রেণি অন্যায় করে তবে তাকে সে শাস্তি দেবে। কিন্তু এই র‍্যাডিক্যাল ধারাটি খুব একটা গুত্ব পায়নি। মার্কসবাদী যে ধারা অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের উপর যার আধিপত্য গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণও তার, এই ধারাটিই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়।

পঞ্চম যে বিষয়, কেন আমরা গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ কথাটি বলি, বলছি প্রধানত চারটি স্তরে গণমাধ্যমের বিস্ফোরণকে আমরা বিচার করতে পারি।

প্রথম স্তরে হচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন --- এটা গণমাধ্যমের বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ উপাদন। উৎপাদনের জগতে আমরা বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে আছি। এই স্তরগুলিকে প্রধান শক্তির উদ্ভাবনদিয়ে বিচার করা হয়। প্রথম স্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যখন বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়েছে। তৃতীয় স্তর বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক, যখন পরমাণু শক্তির আবিষ্কার হয়েছে, এই তৃতীয়

স্তরে অ্যাস্টো ফিজিক্স, বায়ো কেমিস্ট্রি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার প্রভৃতি নানান ধরনের উদ্ভাবনা ঘটেছে যেটাকে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন থার্ড স্টেজ অব রেভিলিউশন অব সায়ান্স এন্ড টেকনোলজি। উৎপাদনের জগতে এই তৃতীয় স্তর গণমাধ্যমের জগতে কিভাবে প্রভাব ফেলছে? গণমাধ্যমের উপর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি প্রধানত বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে যখন যোগাযোগের জন্য উপগ্রহব্যবহার শু হয়েছে। আজকের গণমাধ্যমের জগতে উন্নত যে প্রযুক্তি এসেছে সেটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল এবং কো - অ্যক্সল কেবল যেটা ব্যবহৃত হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন -এর ক্ষেত্রে, কেন না এর ব্যান্ড উইডথ্ স্যাটালাইটের থেকে অনেক বেশি। আজকের গণমাধ্যমের এই বিস্ফোরণে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কারণে টপলারের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা আজকে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির যে প্রয়োগ তাকে বলছেন থার্ড ওয়েভ। ফার্স্ট ওয়েভ হচ্ছে কৃষি, সেকেন্ড ওয়েভ শিল্প, আর থার্ড ওয়েভ হচ্ছে --- আজকের গণমাধ্যম। যেখানে এত বেশি প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। এই পৃথিবীটা একটা গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে এক প্রান্তের কোনো ঘটনা অতিদ্রুত অন্যপ্রান্তে চলে যাচ্ছে। এটা আমরাও জানি, সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন বিপ্লব হয় সে বিপ্লবের খবর সারা পৃথিবীতে পৌঁছাতে তিন বছরের বেশি সময় লেগেছিল; কিন্তু ১৯৯১ সালে ২১ শে ডিসেম্বর যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রে বিলোপ সাধন করা হয় সেটা তিন মিনিটে সারা পৃথিবীর মানুষ জেনে যায়। সুতরাং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এই যে বিশাল উন্নয়ন সেটা গণমাধ্যমের বিস্ফোরণের প্রথম উপাদন। দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি। গণমাধ্যমের সূত্রপাত ঘটেছিল। সংবাদপত্রকে সামনে রেখে। তারপর সংবাদপত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। কেননা সংবাদপত্রের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার মান,সাক্ষরতা হার, মুদ্রণ যন্ত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন শর্ত যুত্ত ছিল। কিন্তু আজকের গণমাধ্যম বিশাল আকার ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, আজকের গণমাধ্যম সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে। আজকের দিনে আমাদের পরিবারের সব থেকে প্রভাবশালী সদস্য হচ্ছে টেলিভিশন আজকে পরিবারের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের ছোটোবেলায় দেখেছি যে পরিবারের শিশুর সামাজিকীকরণের প্রত্রিয়া শু হত তার পরিবারের মধ্য থেকে বাবা, মা, ঠাকুরমা, কাকা, মামা প্রভৃতি আত্মীয় - স্বজনদের মধ্যে। এই সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে সে যখন বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করত তখন সে ঐ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়েই কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বিচার করতে পারত। কিন্তু আজকের গণমাধ্যমের বিস্তৃতি এমন জায়গায় গেছে যে সামাজিকীকরণের প্রত্রিয়া আর বাবা, মা, দাদা দিদিএরা করছে না, করছে বাড়ির টেলিভিশন। টেলিভিশনের নির্দিষ্ট কোনও সিরিয়াল, নির্দিষ্ট কোনও কার্টুন - শো ঠিককরে দিচ্ছে সামাজিকীকরণের প্রত্রিয়া। কাজেই আজকে গণমাধ্যমের শুধু কাঠামোগত নয় অন্তর্বস্তুগত যে পরিবর্ত ঘটে গেছে এটা গণমাধ্যম বিস্ফোরণের দ্বিতীয় উপাদন। তার আজকে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে।

গণমাধ্যমের যে দায়িত্বটা ছিল সেটা এডমন্ড বার্কের কথায় গণমাধ্যম মানুষকে ব্যত্তি মানুষ থেকে সমষ্টি মানুষের রূপান্তরিত করবে, মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে নিয়ে যাবে, মানুষকে ইতিহাসমনস্ক, বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলবে --- এই যে প্রাথমিক দায়িত্বটা ছিল গণমাধ্যমের, বিস্তৃতির সাথে সাথে সে সেই দায়িত্বটা পালন করছে না।

গণমাধ্যম বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় যে উপাদান, সেটা হচ্ছে মালিকানার পরিবর্তন। গণমাধ্যমের একেবারে প্রথম দিকে সংবাদপত্র ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, সরকার সংবাদপত্র প্রকাশ করত, সরকার সংবাদপত্র প্রকাশে সাহায্য করত। সংবাদপত্র তখন ছিল জাতীয় স্তরে। জাতীয় সীমারেখা পার করে আন্তর্জাতিক স্তরে সে যেত না।গণমাধ্যম প্রথম দেশীয় সীমানা অতিত্রম করে ঔপনিবেশিক যুগে। সেই সময় সংবাদ সংস্থা রয়টার ইত্যাদির জন্ম হয়। দ্বিতীয়ত যখন শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পণ্যের বিপণের প্রয়োজন হচ্ছে তখন গণমাধ্যম জাতীয় ক্ষেত্রে থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে এবং সরকারি মালিকানা থেকে ব্যত্তিগত মালিকানার সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও সংবাদপত্রের শুটা হয়েছিল মালিকনায় কিন্তু রেডিও টেলিভিশন প্রথম থেকেই শু হয় ব্যত্তি মালিকানায় এবং প্রথম থেকেই তার বিস্তারের আঙিনা হয় আন্তর্জাতিক স্তর। গণমাধ্যমের বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম জগৎ। দশ বারোটা বহুজাতিক কর্পোরেশনে যেমন কম্পিউটারের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, দশ পনেরটা বহুজাতিক সংস্থা যেমন ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তেমনিই পনেরটা বহুজাতিক কর্পোরেশন আজ গণমাধ্যমের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পের সঙ্গে গণমাধ্যমের এই সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে --- আমেরিকার ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং এর মালিক জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্প

ানি, আমাদের এখানে স্টেটসম্যানের সঙ্গে টাটা পরিবার, হিন্দুস্থান টাইমস এর সঙ্গে বিড়লা, ইন্ডিয়ান এর সঙ্গে গোয়েঙ্কা পরিবারের সম্পর্ক আছে। গণমাধ্যমের মালিকানার ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন---- এর ফলটা কি হচ্ছে? ধন ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা পড়ল তখন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র বাবরি মসজিদ ভাঙার জন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমারাওয়ের কঠোর সমালোচনা করেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলেছে নেশন বিট্রেড, হিন্দুস্থান টাইমস তার সম্পাদকীয়তেবলেছে যে জাতীয় লজ্জা। এই জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখে তারা দাবী করেছে ব্যক্তিগতভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য নরসীমা রাও দায়ী। কিন্তু এখানেই একটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একুশ বাইশটা সংবাদপত্রে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য নরসিমা রাওকে দায়ী করা হল কিন্তু একটা পত্রিকাও সম্পাদকীয়তে নরসিমা রাওয়ের পদত্যাগ দাবী করল না। কেন করল না? কারণ নরসিমা রাও যে নতুন শিল্প নীতি চালু করেছিল তাতে লাভ হচ্ছিল টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কাদের। কাজেই তাদের পরিচালিত সংবাদপত্র নরসিমা রাও এর পদত্যাগ দাবী করতে পারে না। ফলে এই যে মালিকানার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিডিয়া বিস্ফোরণের একটা বড় উপাদান আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এর ফলাফল ভাল হয়নি।

আমাদের চতুর্থ যে উপাদান হচ্ছে বিশ্বায়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্কে। এই সম্পর্কের দুটো স্তরে আছে। প্রথমত হচ্ছে গণমাধ্যম বিশ্বায়নের মাধ্যম। মিডিয়া ইজ দা কেরিয়ার অব গ্লোবালাইজেশন। দ্বিতীয়ত বিশ্বায়নের অঙ্গ হল গণমাধ্যম। এখন বিশ্বায়নের মাধ্যমে কেন গণমাধ্যম ? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৯৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার ৭৫ বৎসর পূর্তি হল। সেই উপলক্ষে আনন্দবাজার ২২শে নভেম্বর সায়েন্স সিটিতে একটা প্রোগ্রাম করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন নরসিমা রাওকে। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু নরসিমা রাওকে কেন? আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক সম্পাদক অভীক সরকার সেখানে যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ, মুক্তবাজার নীতি চালু করে নরসিমা রাও ভারতবর্ষকে নতুন যুগে প্রবেশ করিয়েছেন সেই কারণে আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। বিশ্বায়নের পক্ষে একেবারে সরাসরি সওয়াল করছে আনন্দবাজার। তারপর তারা বলেছে আমরা মুক্তবাজারের পক্ষে, আমরা ধনতন্ত্রের পক্ষে ও আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য রক্ষণশীল দর্শনে বিশ্বাসী। এই নব্য রক্ষণশীল বা নিও কনজারভেটিভ বা নিওকন দর্শন আজকের পৃথিবীতে সব থেকে বিপজ্জনক দর্শন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি বিশেষত জর্জ ডব্লু বুশের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান পার্টি হচ্ছে নিওকন দর্শনের সমর্থক। এই দর্শনের তাত্ত্বিক ইবতিয়ার, সিলিং প্রভৃতি। এরা যে বইপত্র লিখছেন এগুলো মারাত্মক। এদের একজন তাত্ত্বিক বলছেন দি ন্যাশানাল ইনটারেস্ট অব দি বিগ পাওয়ার ইজ নট লিমিটেড উইদিন দা ন্যাশালন বাউন্ডারি অব দ্যাট কান্ট্রি। একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ কোনও সময়ই সেই রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আমেরিকার সামরিক নীতিকে এই নিওকন দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তাদের প্রিএমটিভ অ্যাটাক অর্থাৎ আমেরিকা যদি মনে করে কোনও রাষ্ট্র তার পক্ষে বিপজ্জনক তবে সেই রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে। এই দর্শন মনে করে মার্কস বলে গিয়েছেন ধর্ম হচ্ছে আফিম, তিনি ঠিকই বলেছেন এবং আমরা বলছি ধর্ম প্রয়োজনীয় আফিম। মানুষকে শাসনের জন্য ধর্মকে আফিমের মত ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই নিওকন দর্শন অ্যাবরসনের বিদ্ধে, ডিভোর্সের বিদ্ধে। বস্তুত এটা একটা খ্রিষ্টান মৌলবাদ।

এই নিও কনজারভেটিভ ফিলজফির পক্ষে হচ্ছে আনন্দবাজার। তাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ফাউন্ডেশনগুলো আছে তাতে টাকা দিচ্ছে। এমনকি হান্টিংটনের যে ক্ল্যাস অব সিভিলাইজেশন---এর পিছনেও সে টাকা দিয়েছে।আজকে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছে যে তারা নিও লিবারেল ইকনমির পক্ষে, যার উপরিসৌধ হচ্ছে কনজারভেটিভ ফিলজফি। সুতরাং আজকে মিডিয়া হচ্ছে বিশ্বায়নের বড় হাতিয়ার। দ্বিতীয় একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০০৩ সালে একটা রোগ নিয়ে মিডিয়া সারা বিশ্ব দাণ হইচই করেছিল, রোগটা সার্স। এ নিয়ে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) গত বছর জুলাই মাসে একটা রিপোর্ট বের করেছিল তাতে বলছে ভারতবর্ষে তিনজন সার্স আক্রান্ত হয়েছিল এবং সারা পৃথিবীতে মারা গেছেন সাড়ে আটশোর মতো। সারা পৃথিবীতে যত লোক সার্সে মারাগেছেন ভারতবর্ষে তার অর্ধেক লোক প্রতিদিন টিবিতে মারা যায়। ভারতবর্ষে ১৪ দিনে পনের লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়। আজকে সার্স নিয়ে মিডিয়া, আনন্দবাজারে দাণ হইচই হল। কেন সেই হইচই টিবি নিয়ে, ডায়রিয়া

নিয়ে হয় না? ১৯৯৪ সালে প্লেগে ৫৪ জন মারা গিয়েছিল। তাই নিয়ে গণমাধ্যমে সাংঘাতিক হইচই। কিন্তু প্রতিদিন ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে যে অসংখ্য মানুষ মারা যাচেছ তা নিয়ে কেন হইচই হচেছ না ? হচেছ না তার কারণ এর সঙ্গে বিশ্বায়নের একটা যোগাযোগ আছে। ১৯৯৮ সালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রির্পোটে বলছে যে সারা বিশ্বে ৩২ শতাংশ মানুষ প্রধানত টিবি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগে মারা যায় কিন্তু সারা পৃথিবীতে ওষুধের যে গবেষণা হয় তার দু শতাংশ এই রোগগুলিকে কেন্দ্র করে হয়। বেশির ভাগ ওষুধের গবেষণা হচেছ কসমেটিস মেডিসিন, অর্থাৎ বলবর্ধক, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক, চামড়া ফর্সা করা প্রভৃতির জন্য।

বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ মিডিয়া মনোপলি প্রবন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সমস্ত সার্স, প্লেগ রোগগুলো হয় ফ্লাইং - ম্যানদের অর্থাৎ যারা উড়ো জাহাজে যাতায়াতে করেন, আর টিবি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া হয় ওয়াকিং - ম্যানদের যারা হেঁটে যাতায়াত করে। বিশ্বায়নের যারা প্রবক্তা তারা সব থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে সার্সকে যদি ঠেকানো না যায় তবে বিশ্বায়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বিপ্লব ঘটেছে তা ব্যাহত হবে। ফলে ফ্লাইং - ম্যানদের যে রোগ তা মিডিয়াতে অত্যন্ত গুত্ব পেয়েছিল। তাহলে আজকে মতামত তৈরি ক্ষেত্রে মিডিয়া যে বিশ্বায়নের পক্ষে সব থেকে বড় হাতিয়ার আনন্দবাজারের ৭৫ বছর পূর্তির ভাষণ, সার্স নিয়ে, প্লেগ নিয়ে বক্তব্য --- এসবের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত।

অন্যদিকে গণমাধ্যম নিজেই আজকে বিশ্বায়নের অঙ্গ। সারা বিশ্বের যে সামরিক অস্ত্র ব্যবসা তার ৫১ শতাংশ আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে যে জিনিস রপ্তানি করে সব থেকে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তা হল আমেরিকান চলচিচত্র। যে কারণে ওয়াল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে ফরাসিদের সঙ্গে, বৃটেনের সঙ্গে, ইতালির সঙ্গে তাদের বিরোধ, হলিউডের কাছে ফরাসি চলচিচত্র, ব্রিটিশ চলচিচত্র, ইতালির চলচিচত্র যাদের রেনেসাঁস ঐতিহ্য আছে তারা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়।

এর পরের যে বিষয় সেটা হচেছ বিজ্ঞাপন। সারা পৃথিবীতে ষাটটির মত সংস্থা আছে যারা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞাপনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর প্রভাব সাংঘাতিক। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের পণ্যের জন্য আমাদের ঘরে বিনাপয়সার ফেরিওয়ালা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাড়ির ছোট্ট শিশুটি থেকে শু করে যুবক প্রত্যেকেই বিনি পয়সার এক একজন ফেরিওয়ালা। আপনি ঠিক করলেন একটা ক্যামেরা কিনবেন। আপনার ছেলে বা মেয়ে বলে দেবে কোন ক্যামেরা কিনতে হবে। যদি একটা ফ্ল্যাট টিভি কিনতে চান আপনি পরিবারের সদস্যদের থেকেই জেনে যাবেন কোন টিভির কি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

আজকের গণমাধ্যমের এই যে বিস্ফোরণ সমাজ জীবনে এর প্রভাবটা কিভাবে পড়ছে? আজকের গণমাধ্যম রাজনৈতিকভাবে সব থেকে বেশি প্রভাব তৈরি করেছে। এরা বিভিন্ন দেশের ওপিনিয়ন পোলগুলির মাধ্যমে মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে যে নির্বাচন হয়েছিল তার পূর্ববর্তী যে ওপিনিয়ন পোলগুলি হয়েছিল প্রত্যেকটিতে বামফ্রন্টের পরাজয় ঘোষণা করেছিল। গণমাধ্যম সব থেকে যেটা চেষ্টা করছে সেটা হল বিশ্বায়নের বিরোধী যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি আছে তাকে পরাজিত করা। দ্বিতীয়ত হচেছ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমের আক্রমণ। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম তৃতীয় দুনিয়ার মানুষকে তার সংস্কৃতি থেকে বিচিছন্ন করে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। আবার বিভিন্ন বিদেশি পত্রিকাগুলি আমরা যদি দেখি তবে আমরা দেখব ভারতবর্ষ সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন,বিদ্যাসাগরের ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ হচেছ সাপুড়েদের, সাধুসন্ত, জ্যোতিষীদের ভারতবর্ষ, এটা হচেছ ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশি প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি। এরা আরও চেষ্টা করে মানুষ যেন আত্মশক্তির বলে বলীয়ান না হয়। তার জন্য একটা সাধারণ সংস্কৃতির প্রচার তারা করে। গোটা পৃথিবীর সংস্কৃতিকে আমেরিকানাইজেশন করে দাও। আমেরিকা যা কিছু তাকে নকল করার দিকে আজকে গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ তার প্রভাব তৈরি করছে। আজকে আমাদের দেশে এক ধরনের সংস্কৃতি, এক ধরনের প্রজন্মকে তারা তৈরি করছে যাকে বলে উপীকালচার। যে উপীকালচারইয়ং আপ ওয়ার্কিং মোবাইল পিপল, যারা সব সময় অস্থির, উদ্ধত। এরা ইতিহাসের ধার ধারে না, এদের মূল্যবোধবলে কিছু নেই। এরা অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না, বর্তমানটাই প্রধান বিষয় এবং সমাজে যা কিছু বিক্রয়যোগ্যসেটাই মনে করে এদের পাওয়া দরকার, প্রতিযোগিতার মধ্যে অপরকে হারানোর

মধ্যে এদের আনন্দ। আত্মত্যাগ এদের কাছে মূখার্মি। এই রকম একটা প্রজন্ম, একটা সমাজকে তারা তৈরি করছে। ভারতবর্ষের ভয়াবহ বেকারি এবংগণমাধ্যমের এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে এই প্রজন্ম একটা ভয়ংকর জায়গায় চলে যাবে। আজকে বিভিন্ন বেসরকারিইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্য দিয়ে প্রচুর বেকার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে। একজন বেকার ইঞ্জিনিয়ার আর একজন বেকার সাধারণ গ্রাজুয়েটের মধ্যে হতাশার মাত্রায় পার্থক্য আছে। একজন সাধারণ বিএসসি পাশ করা বেকার সেমনে করে তাকে যখন ভাল করে পড়তে বলা হয়েছিল সে পড়েনি, সেইজন্য তার সাধারণ গ্রাজুয়েট হওয়া। কাজেইআমি যে চাকরি পাচ্ছি না এরজন্য আমার সমাজ দায়ী নয়, বাবা-মা দায়ী নয়, আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়, এরজন্য দায়ী আমি নিজে। সেই ছেলেটির হতাশা থেকে সে হয়তো একটা ফাস্টফুড সেন্টার খুলবে, একটা অটো চালাবে বা ঐ জাতীয় কিছু করবে কিন্তু তার ভাই যে হয়তো ৮০০র উপর হায়ার সেকেন্ডারিতে নম্বর পেয়েছে, জয়েন্টেএকটা র‍্যাঙ্ক করেছে, বাবা ১ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়েছে। সেই ছেলেটা যখন একটা কম্পিউটারিং বা আই টি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হবে আসবে, এসে দেখবে তার সামনে কোনও চাকরি নেই তখন তার হতাশা আর তার দাদার হতাশা এক জায়গায় থাকবে না। তার হতাশা ক্ষোভ তৈরি করবে। তারপর যখনক্ষোভটা ফেটে পড়বে তখন হয়তো তার কাছে এমন একজন আসবে বলবে তুমি তো একজন ভাল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, আইটি ইঞ্জিনিয়ার। তোমাকে এই কম্পিউটারটা দিলাম আর ইন্টারনেটের এই নাম্বার গুলো দিলাম তুমি রাত্রি ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত ওই ওয়েব সাইটগুলো সার্চ করে সেখান থেকে ইনফরমেশনগুলো পাবে তা আমার কম্পিউটারে ট্রান্সফ্রার করে দেবে তার জন্য তোমাকে মাসে আমি দশ হাজার টাকা দেব। সেই ছেলেটি জানতে পারবে না সে কোনও আন্তর্জাতিক চোরা চালান বা অপরাধ চক্র বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল কি না তার যে মেধা সেই মেধাকে কোনো রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবহার করতে পারলনা তার মেধাকে ব্যবহার করল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীচক্র। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বলছে, সাইবার ক্রিমিন্যাল আজকে ভয়ংকরভাবে বাড়ছে। প্রযুক্তি যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে, গণমাধ্যমের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার হচ্ছে, অপরাধ জগতের ক্ষেত্রেও উন্নতমানের প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে এবং সেই প্রযুক্তির ব্যবহার করছে এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল তখন টিভি দেখতে দেখতে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল যে, বাড়ির পঞ্চাশ বছরের একটা প্রাচীর যদি ভাঙা হয় তবে ভাঙতে গিয়ে অন্তত কয়েকজনের হাত পা ভাঙ্গবে বা চোট পাবে কিন্তু সাড়ে চারশো বছরের পুরনো একটা মসজিদ সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো উন্মত্ত করসেবক পাঁচঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালিয়ে ভেঙে ফেলল, একটা লোকও মারা যাওয়া দূরের কথা আহত পর্যন্ত হল না। পরবর্তীকালে বিদেশি সংবাদপত্র তথ্য দিয়েছিল, বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল উন্মত্ত করসেবকরা নয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য আইআইটি-র দক্ষ পঞ্চাশ জন আর্কিটেক এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে মাসের পর মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল যারা মূল কাঠমোটা ভেঙেছিল। বাইরে দেখানো হয়েছিল করসেবকরা ভাঙছে। আপনি বাথম থেকে বেরিয়ে অসাবধানে সুইচে হাত দিলে বিদ্যুতের শক খান, অথচ দেখুন গুজরাটে একদল লোককে গলা জলে ডুবিয়েহাইটেনশান বিদ্যুৎ শক দিয়ে মারা হল। যারা এই কাজ করল তাদের কেউ বিন্দুমাত্র আহত হল না। কেননা এরা প্রত্যেকেই ছিল দক্ষ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। তাহলে আজকে ক্রিমিন্যা জগতে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে আরগণমাধ্যমে কোনটা অন্যায় এই বোধটিকে গুলিয়ে দিচ্ছে। দুর্নীতি যেন সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে।

বাংলা টেলিভিশন, চ্যানেলে দেখা যায় যে দুটো চ্যানেল বাদ দিলে সব চ্যানেল জ্যোতিষী, হাত দেখা নিয়ে প্রচার চলছে। পশ্চিমবাংলার বুকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, খণ্ডিত হলেও নব জাগরণ যেখানে সংগঠিত হয়েছিল সেখানে টেলিভিশনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হাত দেখা জ্যোতিষীর মহিমা কীর্তন চলছে। মানুষের মধ্যে যে মনোভাবটা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে তা হল আপনি বাঁচলে বাপের নাম --- আর অন্য কিছু দেখতে হবে না। আর একটা জিনিস হচ্ছে ভোগবাদ। ভোগবাদ মানে এটা নয় যে আপনার বাড়িতে একটা ওয়াশিং মেশিন আছে, কি একটা টিভি আছে, কি একটা ভিসিয়ার আছে। আপনার বাড়িতে একটা টিভি থাকলেও আপনি ভোগবাদী না হতেও পারেন, আবার টিভি না থাকলেও আপনি ভোগবাদী হতে পারেন। মূল প্রশ্ন হচ্ছে আপনার জীবনের যদি এটাই প্রধান প্রসঙ্গ হয় যে ফ্লাট টিভি আমাতে পেতে হবে। আমার স্ত্রী বা স্বামী অসুস্থ তার চিকিৎসাটা অগ্রাধিকার নয় যেভাবে হোক আমাকে পেতে হবে ফ্লাট

টিভি। আমার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে টেলিভিশন। আমার মিটিং - মিছিল, কোনও আত্মীয় পরিজনের বাড়ি যাওয়া --- আমি ঠিক করব না, ঠিক হবে টেলিভিশন সিরিয়ালের সময় ধরে। এটাকে বলে কনজিউমারিজম বা ভোগবাদ।
কিন্তু এটাই শেষ নয়, এর বিপরীত একটা চিত্র আছে। আজকে আমরা পশ্চিমবাংলার কথা যদি বলি বা ভারতবর্ষের কথা, তা হলে দেখব আমাদের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষে। পলাশি যুদ্ধের ২৩ বছর পরে ১৭৮০ সালে এখানে হিকির গেজেট সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের সাহিত্যের গদ্যাশ্রয়ী যে রূপ তা সংবাদপত্র থেকে আহরিত হয়েছে। আমাদের এখানে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তিনটি গুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। নবজাগরণের ধারাকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়েছে। রাজা রামমোহন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফলে আমাদের রাজ্যে সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ এবং তার বিকাশ নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ধারা, সংবাদপত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে সেই ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ভারতবর্ষের সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের ধারা জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য দিয়ে পুষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদী ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। তৃতীয়ত হচ্ছে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে চেতনা সেই চেতনা আমাদের সংবাদপত্র ধারণ ও বহন করেছে। সুতরাং এটা আমাদের একটা ইতিবাচক দিক। আনন্দবাজার যতই ওয়াশিংটন পোস্টের সঙ্গে কোলাবরেশন কক না কেন, এই ইতিবাচক দিকটিকে সামনে রেখে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে বিকল্প মিডিয়া সেই অলটারনেটিভ মিডিয়াকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। যার প্রধান বক্তব্য হল তথ্য এবং সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে লড়াই সংগ্রামচালাতে হবে। সমস্ত বিকল্পের ক্ষেত্রে এটাই প্রধান। গণমাধ্যমের জগতে আমলাতন্ত্রের যে আধিপত্য আছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের জন্য যে তথ্য, তার প্রতিষ্ঠা করা। তারই ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে পত্রপত্রিকা আছে সেগুলিকে সাজানো প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে আমরা সংবাদপত্র প্রকাশিত করছি। সেই ঐতিহ্য ধারণ করেই আমাদের আগামী দিনে বুর্জোয়া গণমাধ্যমের বিদ্ধে লড়াই করতে হবে, এর জন্য তার বিদ্ধে অন্তর্ঘাতের প্রয়োজন। আমি কিছুদিন আগে একটা আলোচনায় গিয়েছিলাম। যেখানে আমাকে একজন প্র করেছিলেন যে আপনার লেখা এবং বক্তৃতার মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেন যেমন টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইত্যাদি আবার এদেরবিদ্ধে আপনি গালাগাল করেন; এটা কী দ্বিচারিতা নয়। আমি তখন একটা গল্প বলেছিলাম ঃ কোনও এক গ্রামে ঘন অন্ধকার রাত্রে এক অন্ধ মানুষ হাতে একটা হেরিকেন জ্বালিয়ে পথ চলছিল। তিনজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি প্র করল, আরে তুমি তো অন্ধ, তোমার হেরিকেনের কি প্রয়োজন? তখন সেই অন্ধ বলেছিল, আমার নয়, তোমাদের প্রয়োজনে আমি হেরিকেনটা নিয়ে যাচ্ছি যাতে হেরিকেনের আলোয় আমাকে চিনতে পার।
বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার প্রতি কোনও মোহ নেই কিন্তু যদি মানুষকে বোঝাতে হয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বোঝাতে হয় তাহলে অন্তর্ঘাত চালাতে ওদের দেওয়া তথ্য দিয়েই মানুষকে বোঝাতে হবে ওদের প্রকৃত চরিত্রটা কি ? এটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণমাধ্যমের মধ্যে অন্তর্ঘাত চালানোর একটি কৌশল। আর এটা চালাতে গেলে আমাদের পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়া প্রয়োজন। যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ বিচার করব। বুর্জোয়া গণমাধ্যমে যারা কাঁজ করেন তারা হচ্ছেন ভাড়াটিয়া। ভাড়াটিয়া সৈনিক দিয়ে কোনওদিন বড়ো যুদ্ধ জয় করাযায় না, তার প্রমাণ হচ্ছে ভিয়েতনাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে ভিয়েতনামে গেরিলারা এক হাতে ট্রাক্টরের স্টিয়ারিং আর এক হাতে বন্দুকের ট্রিগার নিয়ে ওপরদিকে নজর রেখে আমেরিকার বিমানকে ধবংস করেছিল। ভিয়েতনামের মাটিতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল ভাড়াটিয়া সৈনিক দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। আমরা যারা গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছি, আমাদের পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছি, কেউ ভাড়াটিয়া নয়। আমাদের মেধা আছে, আমাদের মস্তিষ্ক আছে, সাহস আছে, আস্থা আছে, নির্দিষ্ট একটা দর্শন আছে। এটার উপর ভিত্তি করেই আমরা গণমাধ্যমের জগতে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পাল্টা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুধু গণমাধ্যমের জগতে নয়, শ্রেণি বিভক্ত যে সমাজ থেকে সে রস সংগ্রহ করছে, অক্সিজেন সংগ্রহ করছে, সেই সমাজের মধ্যেও বড়ো ধরণের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন সমাজ তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমকে আমরা, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত করতে পারব --- এই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com